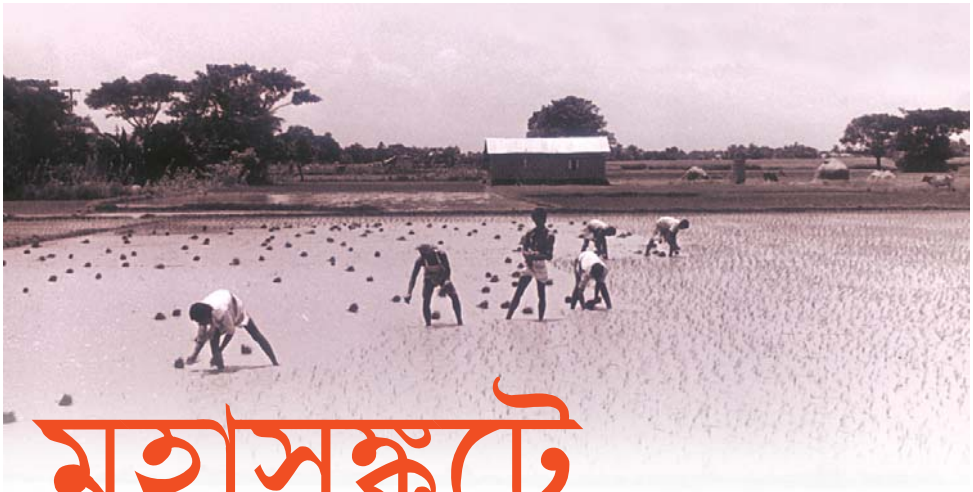

মহাসঙ্কটে কৃষি ও কৃষক

লিখেছেন **রাজু আহমেদ**

বাংলাদেশ কৃষিভিত্তিক দেশ। আবহমানকাল থেকে এদেশের মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পুরোটাই জুড়ে ছিল কৃষি। গত সাড়ে তিন দশকে শিল্প-বাণিজ্য-সেবাখাতের উল্লেখ্যযোগ্য বিকাশ ঘটলেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত এগুলোও ছিল কৃষির ওপর নির্ভরশীল। ফলে কৃষি হয়ে উঠেছে এদেশের অর্থনীতির মূলভিত্তি। কর্মসংস্থানে কৃষির অবদান এখনও সবচে' বেশি। স্বাধীনতার পর এদেশের ৮০ শতাংশ মানুষ কৃষির সঙ্গে যুক্ত ছিল। বর্তমানে যা ৬০ শতাংশ। ১৯৮৩-৮৪ অর্থবছরে মোট গ্রামীণ পরিবারের মাত্র ২৭ শতাংশ অকৃষি খাতের ওপর নির্ভরশীল ছিল। বাকি ৭৩ শতাংশেরই একমাত্র অবলম্বন ছিল কৃষি। কিন্তু বর্তমানে কৃষির ওপর নির্ভরশীল পরিবারের হার ৬৬ শতাংশে নেমে এসেছে। অকৃষি খাতে নিয়োজিত আছে বাকি ৩৪ শতাংশ পরিবার। অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০০৫ অনুযায়ী, দেশের মোট শ্রমশক্তির ৫১ দশমিক ৬৯ শতাংশ কৃষিকাজে জড়িত। শ্রমশক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবছর কৃষি মজুরের সংখ্যা প্রায় দুই শতাংশ হারে বাড়ছে। ফলে একদিকে জমি কমছে বাড়ছে শ্রমিকের সংখ্যা।

এ অবস্থায় উৎপাদন বাড়াতে কৃষকের জন্য উৎসাহজনক কর্মসূচি নিয়ে সরকারের এগিয়ে আসার কথা থাকলেও বাস্তবে ঘটছে উল্টোটা। কৃষি খাতের সঙ্কটের বিষয়টি বিবেচনায় না এনে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ'র পরামর্শে বাড়ানো হচ্ছে সার, ডিজেল, বীজসহ সব রকম কৃষি উপকরণের দাম। কৃষকের ঘাড়ে চাপছে বাড়তি খরচের বোঝা। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে কৃষিতে ভর্তুকি প্রদানের কথা ঘোষণা করা হলেও প্রকৃত কৃষকের কাছে পৌঁছছে না সেসব সুবিধা। ভর্তুকির সবটুকুই খেয়ে ফেলছে মধ্যস্বত্বভোগীরা।

Kg‡Q Rwg, evo‡Q Lv‡``i Pwn`v

দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে খাদ্যের চাহিদা। আবশ্যক হয়ে উঠছে বর্ধিত খাদ্য উৎপাদন। শুধু খাদ্যই নয়, মানুষ বাড়লে তাদের বসবাসের জন্য বাড়াতে হয় ঘর-বাড়ি, যোগাযোগের জন্য তৈরি করতে হয় রাস্তা-ঘাট। আর এসবের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে হাট-বাজার, বিনোদন কেন্দ্র, কল-কারখানা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সব রকম অবকাঠামো। চাপ পড়ে কৃষি জমির ওপর। এভাবেই ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে বাংলাদেশের উৎপাদন উপযোগী কৃষি ভূমি।

কৃষি গবেষক ড. মুয়াজ্জাম হুসেইনের গবেষণা অনুযায়ী, অবকাঠামো নির্মাণের ফলে প্রতিবছর প্রায় ৮০ হাজার হেক্টর আবাদি জমি অকৃষিখাতে চলে যাচ্ছে। ১৯৩০-এর দশকে দেশে কৃষকের মাথাপিছু জমির পরিমাণ ছিল ২ দশমিক ৮ হেক্টর। ১৯৬০-এর দশকে মাথাপিছু জমির পরিমাণ ১ দশমিক ৭ হেক্টরে দাঁড়ায়। ১৯৮৩-৮৪ সালে পরিচালিত কৃষি শুমারী অনুযায়ী, মাথাপিছু জমির পরিমাণ ছিল শূন্য দশমিক ৯ হেক্টর। আর ১৯৯৬ সালের কৃষি শুমারীতে মাথাপিছু জমির পরিমাণ কমে শূন্য দশমিক ৬৮ হেক্টরে দাঁড়ায়। বর্তমানে তা শূন্য দশমিক ৬ হেক্টরে নেমে এসেছে বলে গবেষকরা ধারণা করছেন।

অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০০৫ অনুযায়ী, ১৯৮১-৮২ অর্থবছরে দেশের মোট ভূমির ৬৫ দশমিক ৬৩ শতাংশ ছিল চাষযোগ্য ভূমি। ২০০১-০২ অর্থবছরে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কমে মোট ভূমির ৫৭ দশমিক ১৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে নিট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ছিল ৮৪ লাখ ৫০ হাজার হেক্টর। ২০০০-০১ অর্থবছরে দেশে নিট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কমে ৮৪ লাখ হেক্টরে দাঁড়ায়।

সিপিডি'র সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. উত্তম কুমার দেবের এক গবেষণা প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ১৯৮৯ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত তিন বছরের তুলনায় ২০০১-২০০৩ সময়কালে আউশ ধানের জমি ৪১ দশমিক ২ শতাংশ কমে গেছে । ১৯৮০-১৯৮২ সময়কালে আউশের মোট জমির পরিমাণ ছিল ৩ হাজার ১শ' ৩৮ হাজার হেক্টর। ১৯৮৯-৯১ সালের মধ্যে তা কমে ১ হাজার ২শ' ৩০ হেক্টরে দাঁড়ায়।

একই সময়কালে আমন ধানের জমির পরিমাণ শূন্য ৯ শতাংশ কমেছে। গত এক দশকে বোরো ধানের জমি কমেছে ১৪ দশমিক ৬ শতাংশ। আখ চাষের জমির পরিমাণ গত এক দশকে কমেছে ১২ শতাংশ। ১৯৮৯-৯১ সময়কালে আখ চাষের আওতায় থাকা জমির পরিমাণ ছিল ১শ' ৫৯ হাজার একর। ২০০১-০৩ সময়কালে এটা কমে দাঁড়িয়েছে ১শ' ৬৪ হাজার একর। গত এক দশকের তামাক চাষের আওতায় থাকা জমির পরিমাণ কমেছে ২৩ দশমিক ৫ শতাংশ। আর গত দু'দশকে কমেছে ৪২ শতাংশের বেশি। তেলবীজের জমি গত এক দশকে কমেছে ৮২ দশমিক ১ শতাংশ। ১৯৮৯ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর গড়ে ২ হাজার ২শ' ৬৩ হাজার হেক্টর জমিতে তেলবীজের চাষ হয়। আর ২০০১-০৩ অর্থবছরে তেলবীজ চাষ কমে দাঁড়িয়েছে ৪শ' ৬ হাজার হেক্টরে। গম চাষের আওতাধীন

জমির পরিমাণও আশঙ্কাজনক হারে কমেছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

evo‡Q Lv`¨ Avg`wb

একদিকে বাড়ছে খাদ্যশস্যের উৎপাদন, অন্যদিকে বাড়ছে বিদেশ থেকে আমদানির পরিমাণ। মুক্তবাজার অর্থনীতির কারণে খাদ্য আমদানি অনুমোদনের ফলে অবাধে বিদেশ থেকে আসছে খাদ্যশস্য। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) চুক্তি কার্যকর করতে গিয়ে বাণিজ্য উদারীকরণের ফলে বাংলাদেশের কৃষি ও কৃষিপণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। ফলে খাদ্য উৎপাদনে অর্জিত স্বনির্ভরতার ভিত্তি শক্তিশালী হওয়ার পরিবর্তে আবারো আমদানিনির্ভর হয়ে পড়ছে দেশ। ১৯৭২ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত খাদ্য আমদানির পুরো দায়িত্ব সরকারিভাবে পালন করা হলেও ১৯৯২-৯৩ অর্থবছর থেকে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারিখাতেও খাদ্য আমদানির অনুমোদন দেয়া হয়। ওই বছর ১৪ লাখ ৭৫ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য ঘাটতির বিপরীতে সরকারিভাবে ৮ লাখ ৫০ হাজার এবং বেসরকারিভাবে ৩ লাখ ৫৫ হাজার মেট্রিক টন চাল ও গম আমদানি করা হয়। আমদানি ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে পড়ায় বর্তমানে চাহিদার চেয়ে বেশি খাদশস্য আমদানি হচ্ছে। ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে দেশে খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১৪ লাখ ৬০ হাজার মেট্রিক টন। অথচ ওই বছর সরকারিভাবে ১৯ লাখ ৯৯ হাজার এবং বেসরকারিভাবে ৩ লাখ ৪৮ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য আমদানি করা হয়। ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য উৎপাদিত হওয়া সত্ত্বেও ২০ লাখ ৪ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য আমদানি করা হয়। এর মধ্যে ব্যক্তিখাতের আমদানির পরিমাণ ছিল ১২ লাখ ৩৪ হাজার মেট্রিক টন। গত অর্থবছরে ২৯ লাখ ৩৯ হাজার মেট্রিক টন চাল ও গম আমদানি করা হয়, যা আমদানির ক্ষেত্রে সর্বকালের রেকর্ড।

শুধু চাল বা গমই নয়, আনুষঙ্গিক অন্যান্য কৃষি পণ্যের আমদানিও ব্যাপক হারে বাড়ছে। এক সময় যেসব পণ্য এ দেশের কৃষক উৎপাদন করে দেশের চাহিদা মেটাতো এখন তার অধিকাংশই বিদেশ থেকে আসছে। এরমধ্যে বাজারে প্রাধান্য বিস্তার করেছে ভারত, বার্মা, তুরস্ক ও পাকিস্তানের পেঁয়াজ, চীন, থাইল্যান্ড ও ভারতের রসুন, ভুটান, ইন্দোনেশিয়া, চীন, ভারত, বার্মা ও শ্রীলঙ্কার আদা, ভারত, তুরস্ক ও নেপালের মশুর ডাল, ভারত ও ইরানের জিরা, অস্ট্রেলিয়া, নেপাল ও ভারতের ছোলা, ভারতের মরিচ, সরিষা, ধনিয়া, হলুদ, মালয়েশিয়া ও আমেরিকার সয়াবিন ও পাম তেল ইত্যাদি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য মতে, বাণিজ্য উদারীকরণের ফলে ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছর থেকে

কৃষক এবং কৃষি দুইই অবহেলার শিকার

পরবর্তী ৫ বছরে দেশে পেঁয়াজ আমদানির পরিমাণ বেড়েছে ১ কোটি ৭৬ লাখ ১১ হাজার মেট্রিক টন। অন্যদিকে কৃষকের অনুৎসাহের কারণে এ সময় দেশে পেঁয়াজর উৎপাদন ১০ হাজার মেট্রিক টন কমে গেছে। এ সময় ছোলার আমদানি প্রায় ৩০ লাখ মেট্রিক টন বেড়েছে। আর উৎপাদন ৬২ হাজার মেট্রিক টন থেকে ১২ হাজার মেট্রিক টনে নেমে গেছে। একইভাবে আদা, সরিষাসহ অসংখ্য স্থানীয় ফসলের আমদানি বেড়েছে কয়েক গুণ, কমেছে উৎপাদন। ফলে প্রতিবছরই কৃষি পণ্যের আমদানি বাড়ছে, রফতানি কমছে। মুক্তবাণিজ্যের এ প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে ক্রমেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে দেশের কৃষিখাত।

ঊর্ধ্বমুখী উৎপাদন খরচ

আশির দশকে বীজ, সেচ ও সারের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ বিলুপ্ত করে ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেয়া হয়। সরকারি ব্যবস্থাপনায় সার উৎপাদনের ব্যবস্থা থাকলেও বণ্টন ব্যবস্থা চলে যায় ব্যবসায়ীদের হাতে। নব্বই দশকের গোড়ার দিকে সারসহ বিভিন্ন উপকরণের ওপর ভর্তুকি তুলে দেয়া হয়। এসব কারণে প্রতিবছরই বাড়ছে সার, কীটনাশক, বীজসহ বিভিন্ন উপকরণের দাম। জ্বালানি তেল ও বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় বেড়ে যাচ্ছে সেচ খরচ। সারের মূল্য সরকারিভাবে নির্ধারণ করে দেয়া হলেও, কৃষক কখনো সে দামে সার পায় না। ইরি-বোরো মৌসুমে মোট ব্যবহৃত সারের ৭০-৭৫ শতাংশ ব্যবহৃত হলেও গত ইরি-বোরো মৌসুমে সরকার-নির্ধারিত দামের চেয়ে ২৫-৩০ শতাংশ বেশি দামে সার কিনতে হয়েছে কৃষককে। গত মৌসুমে প্রতি বস্তা ইউরিয়া সারের বিসিআইসি নির্ধারিত মূল্য ছিল ২৮০ টাকা, টিএসপি ৫শ' ২৫ টাকা, এসএসপি ২শ' ২৫ টাকা। অথচ বাজারে ইউরিয়া বস্তা প্রতি ৩ শ' থেকে ৩ শ' ৫০ এবং টিএসপি ৭শ' থেকে ৭শ' ৫০ টাকা, এমওপি ৭ শ' টাকায় বিক্রি হয়েছে। ৫০ কেজির বস্তায় সার কিনতে না পেরে যেসব প্রান্তিক কৃষক ২০-৩০ কেজি সার কেনেন, তাদেরকে প্রতি কেজিতে আরও ১ থেকে দেড় টাকা বেশি গুনতে হয়।

একইভাবে প্রতিবছর বাড়ছে প্রায় সব ফসলের বীজের দাম। এ সঙ্গে কয়েক বছর ধরে যুক্ত হয়েছে তীব্র বীজ সঙ্কট। বাড়ছে সেচসহ সব ধরনের খরচ। সরকারিভাবে ডিজেলের দাম যে হারে বাড়ে সেচযন্ত্রের মালিকরা এর চেয়ে অনেক বেশি খরচ আদায় করেন। গত বোরো মৌসুমের আগে ডিজেলের দাম প্রতি লিটারে ৩ টাকা বাড়লেও, রাজশাহী অঞ্চলে পাম্প মালিকরা সেচ খরচ প্রতি বিঘায় ৫শ' টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮শ' টাকা আদায় করেন। জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পরিবহন ব্যয় বেড়ে গেলে চাষাবাদের উপকরণ ও উৎপাদিত ফসল পরিবহনের জন্যও কৃষককে বাড়তি খরচ বহন কর হয়।

অবহেলায় কৃষি ও কৃষক

'৯০ দশকের গোড়া থেকে পর পর কয়েক বছর কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধির হার বেড়ে যায়। কিন্তু উৎপাদন বাড়লেও সমৃদ্ধি আসেনি কৃষকের ঘরে। কৃষি উৎপাদনের আবশ্যিক উপাদান সার, বীজ, কীটনাশক, জ্বালানি তেলের দাম বাড়তে থাকায় ফসল উৎপাদনে প্রতি বছরই বাড়ছে খরচ। অন্যদিকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল উৎপাদন করলেও অধিকাংশ সময়ই এর ন্যায্যমূল্য পায় না কৃষক। ফলে দু'দিক থেকেই অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে প্রতিনিয়তই ঋণদায়গ্রস্ত হয়ে পড়ছে কৃষক।

তাদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ছে হতাশা।

অন্যদিকে অবাধ বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে বাংলাদেশের কৃষক। দেশে যেসব পণ্যের উৎপাদন ঘাটতি রয়েছে সেগুলোর আমদানি ব্যাপক হারে বাড়লেও রপ্তানি উপযোগী পণ্য বিদেশে বাজার তৈরি করতে ব্যর্থ হচ্ছে। সেসব পণ্যের রপ্তানি না বাড়ায় অনেক কৃষক উৎপাদিত ফসল বাজারে বিক্রি করতে না পেরে ফেলে রেখে চলে যান। এতে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে ফসল উৎপাদনে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন তারা। ফলে কমে যাচ্ছে উৎপাদন। আন্তর্জাতিক বাজারে যেসব কৃষি পণ্যের দাম কম সেগুলোর উৎপাদন সবচেয়ে বেশি কমেছে। শাকসবজির উৎপাদন বাড়লেও সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকিও বেড়েছে। যে সমস্ত কৃষিপণ্যের উৎপাদন বেড়েছে সেগুলোর রপ্তানি বাড়েনি। প্রয়োজনীয় বাজার সৃষ্টি না হওয়ায় কৃষক পণ্যের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ অবস্থায় সবচেয়ে বড় প্রয়োজন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা। কিন্তু কৃষির প্রতি ক্রমশ মনোযোগ কমছে সরকারের।

বছর বছর কৃষকের উৎপাদন ব্যয় বাড়লেও কৃষিখাতে সরকারি ব্যয় ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। স্বাধীনতার পর কৃষিতে মোট ব্যয়ের ৩১ শতাংশ সরকার বহন করলেও এখন মাত্র ৯ শতাংশ বহন করছে। এ কারণে কৃষি উৎপাদন বাড়লেও উৎপাদন-সহায়ক উপাদানের মূল্য বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত ফসলের প্রকৃত মূল্য না পাওয়ায় বছর বছর কৃষক লোকসান দিচ্ছে। সরকার কৃষিতে এক শতাংশেরও কম ভর্তুকি দিচ্ছে। অথচ ডব্লিউটিও চুক্তি অনুযায়ী মোট কৃষি উৎপাদনের সর্বোচ্চ ১০% পর্যন্ত ভর্তুকি দেয়া যায়।

‘এ অঞ্চলের মধ্যে বাংলাদেশেই কৃষকের উৎপাদন খরচ সবচেয়ে বেশি’

এম কে আনোয়ার

কৃষিমন্ত্রী

সাপ্তাহিক ২০০০ : গত কয়েক বছর ধরে কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধির হার কমে যাচ্ছে, কেন?

এম কে আনোয়ার : কয়েক বছর ধরে কমছে এটা ঠিক নয়, তবে গত বছর বেশ খানিকটা কমেছে। এর কারণ আপনি হয়তো আমার চেয়েও ভালো জানেন। ভয়াবহ বন্যার কারণে একটা ফসল প্রায় পুরোটাই ভেসে গেলো। বন্যার কারণে আমন উৎপাদনে প্রায় ২০ লাখ টন ঘাটতি হয়েছে। অন্যান্য ফসলেরও ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু বন্যার পরই আমরা সবকিছু সামলে ওঠার প্রচেষ্টা গ্রহণ করি। এ কারণে বোরোতে লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও ১০-১২ লাখ টন বেশি উৎপাদন হয়েছে। পরিস্থিতি অনুকূলে থাকলে আশা করি এ বছর প্রবৃদ্ধির হার অনেক বেশি হবে।

২০০০ : জিডিপিতে কৃষির অংশীদারিত্ব ধারাবাহিকভাবে কমছে, এটা নিয়ে কী ভাবছেন?

আনোয়ার : এটা তো আমি মনে করি ইতিবাচক প্রবণতা। ভবিষ্যতে কৃষির অংশীদারিত্ব আরো কমবে। দেশ যতো উন্নত হবে, অন্যান্য খাতের বিকাশ যতো হবে, কৃষির অংশীদারিত্ব ততো কমবে। তবে জিডিপিতে অবদান কমে গেছে তার মানে এই নয় যে, কৃষি উৎপাদন কমেছে। ১৯৭০ সালে আমাদের মোট খাদ্য উৎপাদন ছিল ৯০-৯৫ লাখ টন। আর এখন উৎপাদন হচ্ছে দু-আড়াই বিলিয়ন টন। তার মানে উৎপাদন কিন্তু বাড়ছে। নতুন নতুন শস্যও উৎপাদিত হচ্ছে। এক সময় এখানে ভুট্টা উৎপাদন হতো না। গত বছর সাড়ে ৪ লাখ টন উৎপাদন হয়েছে। গমের পুরোটাই আগে আমদানি করতে হতো। অথচ এ ফসলটি এখন ২০ লাখ টন পর্যন্ত উৎপাদিত হচ্ছে। যদিও গত বছর কিছুটা কম হয়েছে। কৃষির অবদান কমছে মানে অন্যান্য খাতের অবদান বাড়ছে। সেসব খাত তো কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কৃষিতে ভ্যালু অ্যাডিশন খুব একটা হয় না। কৃষিপণ্য অন্যান্য খাতে কাজে লাগলে ভ্যালু অ্যাডিশন হয় অনেক বেশি। আমি মনে করি, দেশ যতো দ্রুত উন্নত হবে, জিডিপিতে কৃষির অবদান ততো কমবে। আর অন্যান্য খাতের অবদান বাড়লে পরোক্ষভাবে কৃষকই লাভবান হবে।

২০০০ : আপনি বলছেন, দেশে কৃষি উৎপাদন অনেক বেড়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে প্রশ্ন উঠেছে, উৎপাদন বাড়াতে গিয়ে জমির প্রাকৃতিক উর্বরাশক্তি নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় কী ভাবছে?

আনোয়ার : এটা সত্যি, উৎপাদন বাড়াতে গিয়ে যে হারে রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে জমির উর্বরাশক্তি কমে যাচ্ছে । এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন। কীভাবে এ সমস্যা দূর করা যায় তা বের করতে কাজ হচ্ছে। অর্গানিক সার, জৈব সারসহ মাটির জন্য সহায়ক প্রযুক্তি ব্যবহার বিষয়ে চিন্তাভাবনা চলছে।

২০০০ : কৃষকের শস্য উৎপাদন খরচ ক্রমাগত বাড়ছে। আবার সার, বীজ ইত্যাদির সংকটও প্রায় নিয়মিত হয়ে গেছে। এ সমস্যার সমাধান কীভাবে করবেন?

আনোয়ার : এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে একমত যে, কৃষকের উৎপাদন খরচ বেড়েছে। এ অঞ্চলের মধ্যে বাংলাদেশেই উৎপাদন খরচ বেশি। সেটা নতুন করে হয়নি। আর খরচ কমানোও দীর্ঘমেয়াদি ব্যাপার। কিন্তু সার, বীজের সংকট হচ্ছে এটা ঠিক নয়। গত চার বছরে দেশে এগুলোর কোনো সংকট হয়নি। আমরা শক্ত হাতে সবকিছু ম্যানেজ করেছি। কৃষি উপকরণের সংকট নেই বলেই উৎপাদন বাড়ছে। এতো বড় বন্যার পরও তো কৃষিতে প্রবৃদ্ধি অব্যাহত আছে।

২০০০ : উৎপাদন খরচ বাড়ছে, কিন্তু কৃষক তো ফসলের দাম পাচ্ছে না....

আনোয়ার : কৃষক দাম পেলে তো আমাদেরকে ক্ষমতা ছাড়তে হবে! দেখেন না, এ বছর কৃষক চালের দাম ঠিকমতো পাচ্ছে। তাতে বাজারে দাম কিছুটা বেড়েছে। আর তা নিয়েই হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেছে। দাম কিছুটা বেড়েছে, কিন্তু মানুষের আয়ও তো বেড়েছে। আগে দিনমজুরদের এক দিনের মজুরিতে ৪-৫ কেজির বেশি চাল পাওয়া যেতো না। এখন চালের দাম বাড়লেও এক দিনের মজুরিতে ৬ থেকে সাড়ে ৬ কেজি চাল পাওয়া যায়। কৃষককে ন্যায্য মূল্য দিতে গেলে তো বাজারে জিনিসপত্রের দাম বাড়বেই। আর সেটা হলেই তো সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলা শুরু হয়ে যায়। কিন্তু কৃষকের কথা কেউ ভাবে না। ফসলের দাম না পেলে কৃষক তো উৎপাদন বন্ধ করে দেবে। লোকসান হলে কেন সে উৎপাদন করবে?

ন্যায্যমূল্য পায় না কৃষক

জানা গেছে, কৃষকের কাছ থেকে ধান ক্রয়ের জন্য খাদ্য বিভাগের যেসব শর্ত রয়েছে তার অধিকাংশই কৃষকের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব নয়। ক্রয়কেন্দ্রের আমলাতান্ত্রিকতা এবং দীর্ঘসূত্রতার কারণে সহজ-সরল কৃষকরা সহজে এদিকে পা বাড়ান না। নানা সমস্যার কারণে ধান মাড়াইয়ের পরপরই কৃষকের ধান বিক্রি প্রয়োজন হলেও সরকারি ক্রয়কেন্দ্রে তখন আদৌ ধান কেনা হয় না। সাধারণ কৃষকরা মহাজনের ঋণ শোধ করার জন্য ধান ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি করতে বাধ্য হন। ফলে দালাল-ফরিয়াদের কাছে ধান বিক্রি ছাড়া তাদের কোনো উপায় থাকে না। এ ধান বিক্রিতেও ঠকতে হয় কৃষকদের। গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের কৃষক বিপ্লব চাকী এ প্রতিবেদককে জানান, জমি থেকে ধান ওঠার পর চালকল মালিক কিংবা ফরিয়ারা এক মণ ধান নিয়ে কৃষকদেরকে ৩০ কেজির দাম দেয়।

তাদের অজুহাত, ধান শুকিয়ে মজুদের উপযোগী করতে ১০ কেজি ঘাটতি হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে ঘাটতির পরিমাণ এর অনেক কম হলেও, বাধ্য হয়ে এ রীতি মেনে নিতে হচ্ছে কৃষকদের। ফলে তারা প্রতি মণ ধানের দাম পাচ্ছে ৩শ' টাকারও কম। পাট বিক্রির ক্ষেত্রেও একই বিড়ম্বনা পোহাতে হয় কৃষকদের।

বাজারে উচ্চমূল্যে বিক্রি হলে কৃষকরা সবচেয়ে বেশি ঠকছেন শাক-সব্জি বিক্রির ক্ষেত্রে। মুন্সিগঞ্জের কৃষক আবদুল কাইয়ুম জানান, গত মৌসুমে প্রতি মণ আলু উৎপাদন করতে তার খরচ হয়েছে প্রায় ২শ' ১০ টাকা। জমি থেকে আলু তোলার পর টাকার প্রয়োজন থাকায় উৎপাদিত আলু থেকে সাড়ে ৩শ' মণ ১শ' ৮৫ টাকা দরে বিক্রি করে দিয়েছেন। গত আষাঢ় মাসে আলুর দর ২শ' ৫০ টাকায় উঠলেও, তখন মজুদ ছিল মাত্র ২শ' মণ। ফলে সব মিলিয়ে তার যা লাভ হয়েছে তাতে আগামী বছর আলুর চাষ করবেন কি না সেটা নতুন করে ভাবতে হবে। তিনি জানান, নিজের জমির আলু সাড়ে ৪ থেকে সাড়ে ৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি করলেও এখন তাকেই ১০ টাকা কেজি দরে আলু কিনতে হচ্ছে।

কোথায় যাচ্ছে ভর্তুকির টাকা

চলতি বছরের বাজেটে কৃষিখাতে রাজস্ব ও উন্নয়ন মিলিয়ে ২ হাজার ২শ' ১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। গত অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে এর আকার ছিল ২ হাজার ৩শ' ৭১ কোটি টাকা। অবশ্য ওই অর্থবছরের মূল বাজেটে কৃষিখাতে ভর্তুকি ও সহায়তার পরিমাণ ছিল ৬শ' কোটি টাকা। কৃষি খাতের বিকাশে গত ৮ বছর ধরে সরকার প্রতিবছর বাজেটে কৃষি খাতে ভর্তুকির ব্যবস্থা রাখছে। ভর্তুকির পরিমাণ ১শ' কোটি টাকা থেকে শুরু হয়ে এবার ১২শ' কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে।

বরাবরের মতো এবারও ভর্তুকির অধিকাংশই ব্যয় হবে সেচ ও সার সরবরাহে। সেচকাজে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বিদ্যুৎ বিলের ২০ শতাংশ ভর্তুকি দেয়া হবে। কৃষিভিত্তিক শিল্পে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ বিলেও ২০ শতাংশ হারে ভর্তুকি অব্যাহত রাখা হয়েছে। ইউরিয়া, টিএসপি, ডিএপি এবং এমওপি সারের ওপর ভর্তুকি দেওয়া হবে ২৫ শতাংশ। ভর্তুকির অপর একটি ক্ষেত্র হলো কৃষিজ পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ নগদ সহায়তা। কিন্তু এসব ভর্তুকির ফলে প্রকৃত কৃষক লাভবান হতে পারে না। কারণ ভর্তুকির টাকা সরাসরি তাদের দেয়া হয় না। যে পদ্ধতিতে এ অর্থ বণ্টন করা হবে তাতে প্রকৃত কৃষক নয়, সুযোগ পাবে কৃষিপণ্যের ব্যবসায়ী, সারের ডিলার ও আমদানিকারক, সেচযন্ত্রের মালিক, শিল্পোদ্যোক্তা এবং কৃষিপণ্য রপ্তানিকারকরা। সার ব্যবসায়ী আর সেচযন্ত্রের মালিকরা ভর্তুকি পেলেও কৃষকের কাছ থেকে ঠিকই বাড়তি দাম আদায় করে তারা।

> **অবাধ বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে বাংলাদেশের কৃষক। দেশে যেসব পণ্যের উৎপাদন ঘাটতি রয়েছে সেগুলোর আমদানি ব্যাপক হারে বাড়লেও রপ্তানি উপযোগী পণ্য বিদেশে বাজার তৈরি করতে ব্যর্থ হচ্ছে। সেসব পণ্যের রপ্তানি না বাড়ায় অনেক কৃষক উৎপাদিত ফসল বাজারে বিক্রি করতে না পেরে ফেলে রেখে চলে যান। এতে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে ফসল উৎপাদনে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন তারা। ফলে কমে যাচ্ছে উৎপাদন**

এক সময় কৃষি সেচের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ছিল কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে। এসব সরকারি সংস্থা কৃষিকাজে খোদ কৃষককে তৃণমূল পর্যায়ে সহায়তা করতো। বিএডিসি কার্যক্রমের মাধ্যমে বীজ ও সার সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। এর মাধ্যমেই কৃষিতে ভর্তুকির ব্যবস্থা করা হতো। পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে সেচের বিভিন্ন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সে ব্যবস্থা উঠিয়ে দেয়ায় ভর্তুকির সুবিধা কৃষকের কাছে পৌঁছে না।

কৃষিবিদরা মনে করেন, কৃষিতে যেকোনো ধরনের ভর্তুকির টার্গেট হতে হবে সাধারণ কৃষক। কৃষকদের জন্য, বিশেষ করে ছোট কৃষকের জন্য কম সুদে ঋণের ব্যবস্থা, তাদের কাছে ন্যায্যমূল্যে বীজ, সার, কীটনাশক পৌঁছে দেয়া, কৃষিপণ্যের বাজার ব্যবস্থা গড়ে তুলে ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা, কৃষিপণ্য উৎপাদনের পর সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় কোল্ড স্টোরেজ গড়ে তোলা, বড় সেচের ব্যবস্থা সরকারি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা, শস্য বীমা চালু ইত্যাদি ব্যবস্থা ছাড়া বছর বছর ভর্তুকির পরিমাণ বাড়লেও এতে কৃষকের কোনো লাভ হবে না। কৃষি ভর্তুকির টাকা কোনো ক্রমেই যাতে ডিলার ও ব্যবসায়ীদের পকেটে না যায় তার ব্যবস্থা করা এবং যে কোনো আর্থিক দুর্নীতি কঠোর হাতে দমন করার সরকারি ব্যবস্থা গঠন করা উচিত।

K‡I FY : KI‡Ki `tL

কৃষকদের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে সামান্য পরিমাণ যে ঋণ দেওয়া হয়, তাও তারা ঠিকমত পায় না। অনিয়ম রোধে নানা রকম কমিটি গঠন করা হলেও বাস্তবে এসব কমিটির কোনো কার্যকারিতা দেখা যায় না। গত বছর বন্যা-পরবর্তী চাষাবাদের জন্য সারা দেশে ব্যাপক ঢাকঢোল পিটিয়ে ৫ হাজার ৫শ' ৩৭ কোটি ৯১ লাখ টাকা বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কৃষি ঋণ কার্যক্রম শুরু হলেও ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতি, দলীয়করণ, হয়রানি ও ঋণ প্রদান করতে কৃষকের কাছে থেকে ঘুষ গ্রহণের কারণে অধিকাংশ জেলায় এ কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়ে।

আরো অভিযোগ পাওয়া গেছে, প্রতি বছরই ১০ হাজার টাকা কৃষি ঋণ তুলতে কৃষকদের ৩ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়। এমনকি ঋণ গ্রহণের জন্য বিনামূল্যে বিতরণকৃত ফরমও টাকার বিনিময়ে বিক্রি করেন ব্যাংকাররা। বিভিন্ন অঞ্চলের কয়েক জন কৃষকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, কেউ ঘুষ দিতে অস্বীকৃতি জানালে তার আর ঋণ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। অনেক সময় ঘুষ দিলেও ব্যাংকের কর্মকর্তারা ঋণ দিতে নানা রকম টালবাহানা করেন। লালমনিরহাটের কৃষক ওবায়দুল্লাহ জানান, গত বছর তিনি ১২ হাজার টাকা ঋণের জন্য আবেদন করেন। জমির দলিলপত্র ঠিক থাকার পরও তাকে ঋণ দেওয়া হবে না বলে সরাসরি জানিয়ে দেয়া হয়। তিনি জানান, এলাকার প্রভাবশালীরা মোটা অঙ্কের ঋণ তুলে নেয়ায় প্রকৃত কৃষকরা বঞ্চিত হন। ব্যাংক থেকে ঋণ না পেয়ে কৃষকদের চড়া সুদে মহাজনক, দাদন ব্যবসায়ী এবং এনজিও'র কাছ থেকে টাকা নিয়ে চাষাবাদ করতে হয়।

গত কয়েক বছর ধরে কৃষিতে ভর্তুকি দেওয়া হলেও জিডিপিতে এ খাতের অবদান কমেছে। গত ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ৩শ' কোটি টাকা ভর্তুকি দেয়া হলেও জিডিপিতে কৃষির অবদান দশমিক ৫৪ শতাংশ হ্রাস পায়। ফলে কৃষির সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে কার্যকর কর্মসূচি ছাড়া বছর বছর শুধু খরচ বাড়ালেই এ খাতে বিরাজমান সঙ্কটের সমাধান হবে না। আর দেশের অধিকাংশ মানুষের জীবিকার মাধ্যমে কৃষির উন্নয়নে যথাযথ ব্যবস্থা না নিলে জাতীয় অর্থনীতির স্থায়ী বিকাশ সম্ভব নয়। এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে অচিরেই কৃষিখাতে ধস নামবে বলে কৃষি গবেষকরা মনে করেন।